জনগণের সংগ্রামী ঐক্যে
ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন রুখে দাঁড়াও

১৯ জুলাই বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন রুখে দাঁড়ান, জনগণের সংগ্রামী ঐক্য জোরদার করুন, বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি গড়ে তুলুন এই আহ্বান জানিয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোট এর উদ্যোগে ১৯ জুলাই '১৯ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তোপখানা রোডস্থ বিএমএ মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সারা দেশের ৬৪টি জেলা থেকে ৬৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী প্রতিনিধি সভায় সারাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৪৮ জন প্রতিনিধি তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা রাখেন। সভার শুরুতে সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড সৈয়দ আবু জাফর আহমদ, বাসদের কমরেড জাহেদুল হক মিলু, কমরেড রনজিৎ কুমারসহ সকলের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নুর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবি সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী) এর কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, গণসংহতি আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী সমন্বয়ক আবু হাসান রুবেল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা লিয়াকত আলী। সভায় শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন সিপিবির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, আজকের এই প্রতিনিধি সভায় আপনারা বিভিন্ন জেলার ৪৮ জন বক্তব্য রেখেছেন। এর মধ্যে সমালোচনা, পরামর্শ, আশুকরণীয় বিষয় আছে। জোটের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সেই বিষয়ও আছে। আছে বিগতদিনের কর্মকাণ্ডের ওপরে কিছু মূল্যায়ন। এরকম বহু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ এগুলো দেখবে, আলোচনা করবে, আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা ও পন্থা ঠিক করবে।

তিনি বলেন, সাধারণভাবে দেশের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করার কথা বলতে গেলে একটি দেশের অবজেকটিভ কন্ডিশন (বাস্তব পরিস্থিতি) এবং সাবজেকটিভ প্রিপারেশন (সাংগঠনিক প্রস্তুতি) বিবেচনায় আনতে হয়। বাস্তব পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয় তাহলে অনেক সময় সাংগঠনিক সঠিক উদ্যোগও সাময়িকভাবে অসফল হয়ে যায়। আবার অনেক সময় বাস্তব পরিবেশ পরিপক্ক থাকলেও, যদি সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হয় তাহলে সেটাও অকার্যকর থেকে যায়। রুশ বিপ্লব ১৯১৭ সালে কেন সফল হল, আর ১৯০৫ সালে কেন ব্যর্থ হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করে কমরেড লেনিন রুশ বিপ্লবের প্রস্তুতি ও সাফল্যের শর্ত ব্যাখ্যা করে– এক, দুই, তিন, চার করে দেখিয়েছিলেন।

শাসকশ্রেণিভুক্ত দল ও শক্তিসমূহের বিভেদ-কলহ এমন মাত্রায় গিয়েছে যে, নিজেদের মধ্যে আর আপষ করতে পারছে না। তারা যেভাবে দেশ পরিচালনা করে এসেছে সেভাবে চলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। জনদুর্ভোগ অসহনীয় মাত্রায় গেছে এবং নানা অভ্যন্তরীণ-আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সংকট অনতিক্রম্য ঠেকছে ইত্যাদি। এগুলো হল অবজেকটিভ পরিস্থিতি। তার সাথে দেখিয়েছেন সাবজেকটিভ প্রস্তুতি। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণি—যারা শাসক বুর্জোয়াশ্রেণিকে আঘাত করে, ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেরা ক্ষমতা কব্জায় নেবে তারা কী

অবস্থায় আছে? তাদের পরিমাণ ও গুণগত অবস্থা মিলে সংগঠিত শক্তি কোন পর্যায়ে এবং অপরাপর শোষিতশ্রেণি—শ্রমজীবী, কৃষক, ছাত্র-যুবক, নারীসহ অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা কেমন? এই মুহূর্তে তারা কী ধরণের কর্মকাণ্ডের জন্য মানসিকভাবে ও সার্বিকভাবে তৈরি? এদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যে মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তি, তার প্রতি তাদের আস্থা-ভরসা কেমন আছে, ইত্যাদিসহ পারিপার্শ্বিক ও বিশ্বপরিস্থিতির সার্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়েছেন।

এখন বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, অর্থাৎ যে অবজেকটিভ কন্ডিশন দেশে বিদ্যমান আছে তা বিপ্লবী অভ্যুত্থান দাবি করে। কিন্তু সাংগঠনিক প্রস্তুতি তথা সাবজেকটিভ প্রস্তুতি যে জায়গায় রয়েছে তা সাধারণ সংস্কারের উপযোগী শাসন কাঠামো তৈরি করার সামর্থ্যও অর্জন করতে পারেনি। তা হলে কী যা চলছে, তাই মেনে নিতে হবে? নিশ্চয়ই তা নয়। আমাদের সামর্থ্য গড়ে তুলতে হবে। আমরা এই সময়ে শোষকশ্রেণির পক্ষে দেশ পরিচালনাকারীদের ব্যর্থতা তুলে ধরি—জনগণের গণতান্ত্রিক, মৌলিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকারগুলো তারা কীভাবে লঙ্ঘন করছে, লুটপাট-দুর্নীতি, অন্যায় কীভাবে করে চলেছে তা দেখিয়ে জনগণের আদর্শিক-রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে মুক্তির উপায় দেখানোসহ গণ-আন্দোলনের চাপে যতটুকু সম্ভব গণদাবি আদায় করি। এসব আমরা জনগণের ঐক্যের শক্তির ওপর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও আন্দোলনে ছোট ছোট বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে জীবনমান উন্নয়নের জন্য করে থাকি। এখন আওয়ামী লীগ দেশ শাসন করছে। ওরা যে বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থে, যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজনীতি করছে সেটাতে কি ওরা লুটেরাশ্রেণির জন্য খারাপ কিছু করছে? বরং জনস্বার্থের বিপরীতে তাদের স্বার্থই তো ওরা হাসিল করছে। এখন এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে একই পথ ও পন্থায় আপনি যদি দেশ চালাতে যান, সেই ক্ষেত্রে ওরা যেভাবে দেশ পরিচালনা করছে তার বিকল্প আপনি কিছু করতে পারবেন কী? সামান্য কিছু হেরফের ছাড়া আপনি কী করবেন এর বাইরে? ফলে, ওরা ওদের স্বার্থের কাজটা ঠিকমতোই করছে। আমরা কেন সমালোচনা ও প্রতিবাদ করছি? কারণ, এটা গণ-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক নয়। যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছিল, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ ব্রিটিশবিরোধী, পাকিস্তানবিরোধী, উপনিবেশবিরোধী লড়াই করেছিল তার সাথে শাসকদলের কর্মকাণ্ড সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সেই সমালোচনা করে সেটা আমরা মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করি, শাসকদের মুখোশ উন্মোচন করার চেষ্টা করি। মানুষের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যুক্তিবাদী মন তৈরির চেষ্টা করি, আমরা যে বক্তব্য রাখি তার পক্ষে মতামত তৈরির চেষ্টা করি। বিকল্প শক্তি, পথ ও পন্থা হাজির করার চেষ্টা করি।

খালেকুজ্জামান বলেন, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ অনিরসনীয় সংকটে আছে। আমেরিকা থেকে শুরু করে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে স্থায়ী সংকটের আবর্ত থেকে বের করে পরিচালনা করা এখন একটা দুরূহ কাজ। বাংলাদেশে এই দুরূহ কাজটি সাফল্যের সাথে কে করতে পারছে বা করার সক্ষমতা রাখে? এটা বুর্জোয়াশ্রেণির বিবেচনা ও মাথা ব্যথার কারণ। কেন বাংলাদেশে পুলিশ, সরকারি আমলা সরকারি কর্মকর্তা, টাকাওয়ালা শিল্পপতি-বণিক, ব্যবসায়ী সবাই মিলে এক হয়ে গেল যে, দেশে-বিদেশে ভোট জালিয়াতির অসংখ্য ধরা-অধরা ব্যবস্থা থাকতেও কেন চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে রাতের বেলা তাদের ভোট করতে হবে? আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বের পেছনে কেন একযোগে সবাই দাঁড়িয়ে গেল? দাঁড়িয়ে গেছে, কারণ তারা দেখেছে যে, একটা অরাজক পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কাম্য নয়, যা আদি পুঁজি সঞ্চয়েরকালে গ্রহণীয় বা সহনীয় ছিল। এখন কিছু লোকের হাতে বিপুল টাকা জমে গেছে। লুণ্ঠনের পরে তারা এখন একটা দীর্ঘস্থায়ী শান্ত পরিবেশ চায়। আমাদের দেশে কোটিপতির সংখ্যা, লাখ ছাড়িয়েছে। সাবেক এনবিআর এর চেয়ারম্যানের মতে ৩৬টা পরিবার বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ব্যাংক, পুঁজিবাজারসহ গোটা অর্থব্যবস্থার লুটপাটকারী, বিদেশে টাকা পাচারকারী, মেগা প্রকল্পের মেগা লুণ্ঠনকারী, দুর্নীতিবাজগোষ্ঠী মিলে একটা সিন্ডিকেশন তৈরি করেছে। এরাও এখন বাংলাদেশে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও একটা প্রতিযোগী কিংবা সহযোগী শক্তি হতে চায়। দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করা, তাদের সাথে কোলাবরেশন করা এবং এই পুঁজিকে আরও শক্তিশালী করে তারা এগোতে চায়। মানুষ এই সরকারের বিরুদ্ধে। মানুষ যদি ভোট দিতে পারতো তাহলে উজাড় করা ভোট এই সরকারের বিরুদ্ধে দিত। এর অর্থ এই নয় যে, বিএনপির প্রতি মানুষের খুব সমর্থন ছিল। কিন্তু এর বাইরে কোথায় দেবে? তখন বলত এই বামপন্থীরা তো জিতবে না, সবজায়গায় আমাদের প্রার্থীও নাই। ফলে জেতার সব ভোট পড়ত ধানের শীষে। সেখানে তাদের আপত্তি ছিল না। কারণ তারা তো এভাবে পালাক্রমে দেশ শাসন করে এসেছে। কিন্তু এবার তারা বুঝেছে যে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় না থাকে তাহলে লুটপাটের ক্ষেত্র দখল করতে গিয়ে আরেকটা বড় মাপের বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হবে। ফলে শান্তিপূর্ণ লুটপাট ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তারা যেপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তা বাধাগ্রস্ত হবে। সেজন্য তারা মোটামুটি সবাই একমত হয়েছিল। বিরোধ যতটুকু ছিল তারাও গড্ডালিকায় গা ভাসিয়েছে অথবা নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

কমরেড খালেকুজ্জামান আরও বলেন, এখন এগুলো বিশ্লেষণ করলে হয়তো আরও কিছু কথা আসবে। এই বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অতীতে কী করে নাই? স্বাধীনতার পরে প্রথমে তারা পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা চালু করল, তিন বছরও সেটা টিকল না; করলেন একদলীয় ব্যবস্থা, সেটাও টিকলো না। শেখ মুজিবকে সপরিবারে খুন করে, সামরিক শাসনের গায়ে বেসামরিক

আলখেল্লা পরিয়ে মার্শাল ডেমোক্রেসি চালু করল, তাও টিকলো না। '৮০ সালে জিয়া হত্যার মধ্যদিয়ে আসলো আরেকটা মার্শাল ল। সেই মার্শাল ল'র মাধ্যমে জে. এরশাদ ক্ষমতায় আসল। সেটা আবার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উৎখাত হলো, তখন আসলো সিভিল, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। সেটাও স্বাভাবিকভাবে চালাতে পারল না। তখন তাকে সচল ও কার্যকর করার জন্য আসলো ভোট রেফারি—তিন মাসের তদারকি ব্যবস্থা। এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাও তিন মাসের বদলে দুই বছর মেয়াদে ওয়ান এলেভেন-এ অর্থাৎ অঘোষিত সামরিক বিধানে পুতুল সরকারে গেল। তারপর আবার তারা দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় ফিরতে চাইলো। সেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থাও টিকলো না। আবার একদলীয় ব্যবস্থার দিকে চলে গেছে। এর মধ্যে ২ জন প্রেসিডেন্ট খুন, ৪ জাতীয় নেতার জেল হত্যা, ৫ বার জরুরি অবস্থা, ২টা সরাসরি সামরিক শাসন, ১টা পরোক্ষ সামরিক শাসন, ১৯টা ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার, গণ-আকাঙ্ক্ষা, সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি বিলুপ্তিকরণ, কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মী খুন, কয়েক শ সিপাহি খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি কাজগুলি করল। এরা কতটা নির্দয়, নির্মম ও নিষ্ঠুর হতে পারে, কতো প্রতারণা করতে পারে এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য তা মানুষ দেখেছে। তাদের এই কাজগুলো করতে হয়েছে এবং আরও করবে তারা লাগামহীন লুণ্ঠনের পুঁজিবাদীব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। এটা একটা দিক। কিন্তু আমাদের যদি এই দিকটা খেয়ালে না থাকে যে, আমরা যে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই তার জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কাজগুলো কী? আমরা যখন জনগণকে সচেতন করার জন্য শাসকদের গণবিরোধী কাজের কথাগুলো বলি তখন অনেকসময় বলতে ভুলে যাই যে, আমাদের গণমুখী কাজটা কী?

১৯ জুলাই বাম গণতান্ত্রিক জোটের প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের একাংশ

খালেকুজ্জামান বলেন, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জোটবদ্ধ আন্দোলনের সংকট ও সম্ভাবনা ইত্যাদি কাজ নিয়ে আলোচনা করার জন্যই মূলত এই প্রতিনিধি সম্মেলনটা ডাকা হয়েছে। আগামী এক বছর পরে ২০২১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হবে। এখন যেহেতু এ টু বি এবং বি টু এ, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ টু বিএনপি এবং বিএনপি টু আওয়ামী লীগ, এই সমীকরণটি কার্যকর নেই। আবার এই সরকারের প্রতি মানুষের আস্থাও নেই, তাহলে বিকল্প কী? কোন্ রাজনীতি, কোন্ ধারার রাজনীতি কাঙ্ক্ষিত বিকল্প হিসাবে নিকটবর্তী ও দৃশ্যমান হতে পারে। এখন রাজনৈতিক ধারা বলতে একটা হল বামপন্থী ধারা; একটা উদারপন্থী বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া ধারা; একটা হল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ধারা; আরেকটা হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট ধারা। বাঙালি এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ, বিএনপি হল বুর্জোয়া ফ্যাসিস্ট ধারা, তার সহযোগী শক্তি ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের সবচেয়ে অগ্রণী জামায়াতে ইসলাম এবং জাতীয় পার্টিকে যুক্ত করে একই ধারা, যা এখনও প্রধান ধারা। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ধারার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জামায়াতে ইসলাম, এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং নানাভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এই শক্তি দুর্বল হয়ে আছে। অন্য মৌলবাদী শক্তিগুলো এখন সেভাবে সংগঠিত হিসেবে নাই। কিন্তু তাদের গ্রাউন্ডওয়ার্কের কাজটা নানাভাবে সম্প্রসারিত হয়ে আছে। উদারপন্থী শক্তি—সিভিল সোসাইটি, এরা বহুধারায় বিভক্ত, এদের রাজনৈতিক শক্তিসমূহ অনেক বেশি দুর্বল। এখনও তাদের সামনে আসার মতো পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বাকি রইল বাম ধারা। দুর্বলতা সত্ত্বেও এখন এই ধারাটাই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আছে। কিন্তু এই শক্তি কীভাবে অগ্রসর হবে? কী করবেন? ২০২১ সালে বামপন্থীদের একটা চ্যালেঞ্জ নিতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। এখন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ হারিয়ে গেছে। যে তিনটা অঙ্গীকার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল—সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার; আর স্বাধীনতার পরে সংবিধানে মূল স্তম্ভ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল—সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ; এর একটাও অক্ষতভাবে কার্যকর নাই। বুর্জোয়ারা সব মলিন ও বিদায় করে দিয়েছে। কারণ ওগুলো বাস্তবে বহাল রেখে শোষণমূলক পুঁজিবাদের বিকাশ কিংবা অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়।

সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচারের কী অবস্থা? এখন আমাদের মানুষকে বলতে হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বাংলাদেশের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে হলে এই ৪৮ বছর যারা দেশ শাসন করেছে তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে কেবলমাত্র বামপন্থীরা। কীভাবে পারবে? তার জন্য দুইটা পন্থায় অগ্রসর হতে হবে। আমাদের ভোটকে মোকাবিলা করতে হবে আর গণ-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিতে হবে। এই হচ্ছে বামপন্থীদের সামনে এখন প্রধান কাজ বলে আমি মনে করি। কারণ, গণ-অভ্যুত্থান ছাড়া এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারা যাবে না। আর ভোট আসলে ভোটকে মোকাবিলা করার সামর্থ্য অর্জন করা ছাড়াও গণ-অভ্যুত্থানের পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না। দুটোই লাগবে। এক্ষেত্রে লেনিনের একটি বক্তব্যের সারকথায় দেখা যায় সব সময়ের জন্য নির্বিশেষে না হলেও ১৯১২ ও ১৯১৪ সালের ডুমা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কমরেড লেনিন বলেছিলেন, নির্বাচন শুধু প্রয়োজনীয়-ই না বরং অবিচ্ছেদ্য ছিল। ব্যতিক্রমী বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া street and ballot box কে either, or হিসেবে দেখা ঠিক নয়। এই কথাটার মর্ম কী? এখন সবাই বলছেন যে, ২৯ ডিসেম্বর '১৮ রাতে ভোট হয়ে গেছে, এটা যখন আমরা জনগণকে বলছি, তখন সেটা ঠিক আছে। কিন্তু নিজেদের ক্ষমতা কতটুকু সেটাও বিবেচনা করতে হবে। ৩০০টা এলাকায় ৫ শ, ১ হাজার, দশ হাজার লোক নিয়ে সেটা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কি আমাদের ছিল? আমাদের সেটা নেই তো। তাহলে আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচন হবে কীভাবে? আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার এই জায়গা তৈরি করতে হবে না? আমরা কি ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছিলাম? পারি নাই। সেই জায়গায় এসে ওদের যে টাকারশক্তি, গুন্ডারশক্তি, পেশিরশক্তি এবং যত শক্তির কথা বলছি কিন্তু আমাদের যে শক্তি শ্রমজীবী মানুষ সেই শক্তিকে সংগঠিত করে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করা, সেই কাজটা কি আমরা করতে পেরেছিলাম? পারি নাই। না পারাটায় কোন অপরাধ হয় নাই, বা একারণে আমরা হতাশ হয়েও যাব না। একথাটা এই কারণে বলা যে, নিজেদের শক্তি-অবস্থার পরিমাপ করা। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি কিন্তু এটা বলি নাই যে, আমরা কিছুই করতে পারি নাই। নিজেদের অবস্থা পরিমাপ করার জন্যই কথাগুলো বলা। তাহলে আগামীতে করণীয় কাজটা কী? সেই মৌলিক করণীয় কাজটা নির্ধারণ করে দলীয় ও জোটবদ্ধ শক্তিতে এগিয়ে চলা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে শ্রমশক্তি ৬ কোটি ৩৫ লাখ। এই যে শ্রমশক্তি, আপনি যদি গণ-অভ্যুত্থানের কথা ভাবেন, অভ্যুত্থানকারী মূল শক্তি বলেন, আর সবচেয়ে অগ্রগামী শক্তি বলেন, এই শক্তিই তো। এই শক্তিকে সংগঠিত ও সংহত করার জন্য, বুর্জোয়া প্রভাব বলয় থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আমরা কী করছি, কতটুকু করছি? কীভাবে এই শক্তিকে পক্ষে টানবো, কীভাবে তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে নেব, আন্দোলনের ঢেউয়ের ওঠানামায় এগিয়ে যাব তা ভাবতে হবে। এখন এখানে জাতীয় ফেডারেশন আছে ৩৪টা, সেক্টরভিত্তিক সংগঠন, ইউনিয়ন আছে ৭ হাজার ৮৮৫টা। তাদের মধ্যে শাসকশ্রেণির স্বার্থভিত্তিক ঐক্য কতটা আর বিপ্লবী আদর্শভিত্তিক সাংগঠনিক পরিধি কতদূর? এই জায়গায় শ্রমিকদের জন্য যে আইন, সেটা কতটা গণতান্ত্রিক আর কি ধরণের আইনি নিপীড়নের মধ্যে তারা আছে? আমরা কি ধরণের আইন চাই আর যখন তাদের উপর নিপীড়ন হয় তখন আমরা তাদের নিয়ে কতখানি সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি? দুইটা জিনিস—একটা হল যখন তাদের উপর অন্যায় হয় তখন কতখানি শক্তি নিয়ে আমরা সেটা প্রতিরোধ করতে পারি আর আমরা কী ধরণের আইন ও অধিকার শ্রমিকদের জন্য প্রস্তাব করছি সেটা কতটা গণতান্ত্রিক, মৌলিক অধিকার হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির প্রাপ্য তা পরিষ্কার করতে পারছি। শ্রম আইনের অনেকগুলি অগণতান্ত্রিক ধারা আছে ২৩, ২৬ ও ২৭ এরকম বহু ধারা আছে যে ধারাগুলি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, মৌলিক অধিকার বিরোধী। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণি বুঝবে শোষণ ও বৈষম্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে প্রকৃত গণতন্ত্র হয় না আর সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজ, শাসনব্যবস্থায় শোষণ ও বৈষম্য স্থায়িত্ব পেতে পারে না।

কৃষকদের ক্ষেত্রেও বুঝ-বিবেচনাগুলোকে কার্যকারণ ধরার উপযোগী করে তুলতে হবে। সেগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে চাই না। কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। মণপ্রতি ধানের দাম ১০৪০ টাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবার পরও কৃষক ৫০০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এগুলো তো আমরা দেখছি। এই কৃষকরা ফড়িয়াদের, মধ্যসত্বভোগীদের বা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে। এখন কথা হলো এই কৃষকদের মাঝে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তুলতে হবে। সরকার যে ১০৪০ টাকা বলেছে সেই টাকাতেই কিনতে বাধ্য করতে হবে। এলাকায় যে ফসলটা উঠবে তা ন্যায্য দামে কিনতে হবে। সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ করার দায়িত্ব সরকারের। সরকারকে বাধ্য করার জন্য আন্দোলন করতে হবে, আর আমরা কী করবো সে কথা বলা। আমরা যদি রাষ্ট্রক্ষমতায় যাই তাহলে আমরা তা কার্যকর করব। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতায় না যাই ততক্ষণ আমরা বাধ্য করব শাসকদের। গণতান্ত্রিক আইন, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-সংস্কৃতি কিছুই কাঙ্ক্ষিতরূপে দেশে নাই। শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি আমরা ক্ষমতায় গেলে কীভাবে করব সেই কথা বলতে হবে। আমরা কি বিশেষ ক্ষমতা আইন রাখব? আমরা কি ৫৪ ধারা রাখব? আমরা কি আইসিটি এ্যাক্ট ইত্যাদি রাখব? না রাখব না। এইভাবে যে সকল অগণতান্ত্রিক আইন আছে, সেগুলোর প্রভাব কি, সেগুলো কেন সরকার ব্যবহার করে, আর আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক আইনের প্রয়োগে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব, জনগণের ইচ্ছা, স্বার্থের রূপায়ন ঘটাবো তা বলব এবং আপেক্ষিক অর্থে হলেও গণতান্ত্রিক কিছু আইন আছে যেগুলো তারা মানে না, সেটাও দেখাব। আরও কিছু আইন আছে যেগুলো সত্যিকার অর্থে কালো আইন।

এগুলো মানুষকে নিগৃহীত করার আইন। সেগুলো সুনির্দিষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। বিচারব্যবস্থা নিয়ে কি বলবেন? নিম্ন আদালত সম্পূর্ণরূপে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন। তাহলে আমরা এটা স্বাধীন করব। বিচারক নিয়োগে মানদণ্ড বলে যথার্থ কিছু নাই। হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট এর বিচারক নিয়োগের মানদণ্ড দুইটা। একটা হল ১০ বছরের ওকালতি আর ১০ বছরের জজিয়তি। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে এটা কি কোন মানদণ্ড হতে পারে? দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও কর্মকর্তা নিয়েগের মানদণ্ড কী হবে? এই যে নির্বাচন কমিশন গঠনের সার্চ কমিটি এটা কোন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নাই। এই রকম যে অ্যাডহক কাজগুলি তারা করছে তার আইনগত ভিত্তি দিতে হবে। একটা হল প্রতিরোধ করা–আরেকটা হল বিকল্প দর্শন। আমরা আইনের ক্ষেত্রে, বিচারের ক্ষেত্রে, দুর্নীতি দমনসহ সকল কিছুতে কী কী করব পুরো চিত্র তুলে ধরতে হবে। এটা খুবই সহজ না হলেও দুঃসাধ্য নয়। এটা আমাদের করতে হবে।

খালেকুজ্জামান বলেন, এরকম আরও বিষয়গুলো নিয়ে কনভেনশন করার চিন্তা আছে। এর জন্য আগে নিজেদের কিছু হোমওয়ার্ক, ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হবে। তারপর আমরা দেশবাসীর কাছে বলতে চাই যে, এতদিন ধরে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণি যে প্রক্রিয়ায় দেশ শাসন করে এসেছে তা আমাদের সংবিধান পরিপন্থী, গণতান্ত্রিক আইনের পরিপন্থী, ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী, কৃষক স্বার্থের পরিপন্থী, ছাত্র সমাজসহ সকল মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। শোষিত জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। আর আমরা কীভাবে করতে চাই, সেটা যে জনগণের পক্ষে কল্যাণের তা বোঝাতে হবে। এই প্রস্তাবনাটা নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষদের আমরা ডাকতে চাই। যেমনি করে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুবক, নারী-সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রকৌশলী, চিকিৎসক-কৃষিবিদদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান ও সংগ্রাম ছিল। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি, তাদের মতামত নিতে পারি। বলতে পারি যে আমরা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে একসাথে লড়াই করেছিলাম, যে দাবি ছিল সে দাবি বাস্তবায়িত হয় নাই। আজকের এই পরিস্থিতিতেও আমরা মনে করি অবস্থা বদলাতে হলে ব্যবস্থা বদল দরকার। এই শাসক শ্রেণির পক্ষে তা সম্ভব নয়। গত ৪৮ বছরের শাসনে তা পরিষ্কার। এই ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের পরামর্শ দেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত হন। আর এর পাশাপাশি জোটে নিজেদের মাঝে সংহতিটা বাড়াতে হবে। জোটের শরিক দলগুলো নিজেরা ঝগড়া করার দরকারটা কি? আমাদেরকে আগে বুর্জোয়াদের সরাতে হবে। কারণ একজন বক্তা বললেন বুর্জোয়ার বিকল্প হল বাম। এটাই যদি মনে করেন, তাহলে নিজেরা নিজেরা সংঘাত করার দরকার নাই। আরও বেশি নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হন। আগে এই বুর্জোয়া ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীকে পরাস্ত করেন, পরাস্ত করার পরে এসে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে, যেহেতু কমিউনিস্ট নৈতিকতায় বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি-তর্কে, দ্বন্দ্বে-সমন্বয়ে আমরা চলব। সত্যানুসন্ধানে একযোগে মিলে আপনি বাম গণতান্ত্রিক সরকার করেন, বা কোন দলের নেতৃত্বে বিপ্লব করেন, যুক্তিসঙ্গতভাবে যেটা এগিয়ে যাবে সবাই মিলে সেটার পিছনে দাঁড়াব। এই তো পথ। কিন্তু এখন আগে থেকেই এটা নিয়ে ঝগড়াঝাটিরতো দরকার নেই। কিছু টুকটাক বিরোধ হয়, যেমন প্রার্থী নিয়ে হয়, কিছু এলাকায় বনিবনা নিয়ে সমস্যা হয়, এগুলো নিয়ে কেন্দ্র এবং স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা করে মীমাংসা করে নেবেন, যদি আপনার মূল লক্ষ্যটা ঠিক থাকে। আমরা যেহেতু মূল শত্রুকে উচ্ছেদ করতে চাই তাহলে নিজেরা অন্তর্দ্বন্দ্ব করলে তো পারবেন না। এই সময় আপনার মূলশত্রু কারা, সেটা ঠিক করে নিজেরা নিজেদের আঘাত না করে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। ঐক্যটা আরও সুদৃঢ় করা দরকার।

কমরেড খালেকুজ্জামান আরও বলেন, এই সময়ে জোটকে সংহত করা, শরিক দলসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য কমিয়ে আনা, পারস্পরিক সহায়তা বাড়িয়ে আমাদের কর্মশক্তিকে কীভাবে বাড়ানো যায় এই উদ্যোগ নেয়া দরকার। বুর্জোয়াদের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জনগণের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করা, জোট ও দলের কেন্দ্র থেকে নিচ পর্যন্ত দূরত্ব কমিয়ে কাজের গতি বাড়ানো, জোটভুক্ত দলসমূহের শ্রমিক, কৃষক ও নারী সংগঠন, ছাত্র, সংস্কৃতি, পেশাজীবীদের সংগঠনের মিলিত কার্যক্রম গড়ে তোলা এবং এগুলোকে ক্রিয়াশীল করা। যেকোন বিরোধ নিষ্পত্তিতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় মেকানিজম গড়ে তোলা। কেন্দ্রের অনুরূপ সকল সাংগঠনিক স্তরে পরিচালনা পরিষদ তৈরি করা, আন্দোলন এবং নির্বাচনে পূর্ণ সামর্থ্য অর্জন করা, জোটের তহবিল গঠন করা, প্রচার ও দাপ্তরিক কাজ নিয়মাবদ্ধ করা। নিয়মিত কাজের বাইরে বছরে কমপক্ষে একবার প্রতিনিধি সম্মেলন এবং সুধীজনকে নিয়ে কনভেনশন করা যেতে পারে। যার যেখানে যতটুকু সাংগঠনিক অস্তিত্ব আছে তাকে জোটের শক্তি হিসেবে ভাবা, কর্মসূচি পালনে কর্মী নির্ভরতা থেকে জননির্ভরতায় নিয়ে যাওয়া। এই হলো টকিং পয়েন্ট যা আলোচনায় এসেছে। বাকিগুলি আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরে জানাব। এখন আমাদের আগের মতো করে নেগেটিভ বিষয়টা বেশি বেশি করে বলার দরকার নাই। আমরা অভ্যাসের শিকার হতে চাই না। আমরাও কথা বলার সময় ৯০ ভাগ নেগেটিভ আলোচনাই করছি, অনেক সময় এটা করতে হয় মানুষের মধ্যে একটা ধারণা দেয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের নিজেদের বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা আলোচনা আসে না। এটা চলতে থাকলে ইতিবাচক রাজনীতি মার খাবে। জনগণ থেকে পিছিয়ে যাব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। যখন আমরা নিজেরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি তখনও দেখা যায় অনেক কমরেড প্রথমে একটা উত্তেজনামূলক বক্তব্য দিয়ে দেয়, আমরা নিজেদের নিজেরা উত্তেজিত করে তো লাভ নাই, জনগণকে লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে উত্তেজিত করতে হবে, জনগণকে অংশীদার করতে হবে। সেকারণে আমার মনে হয়, অবস্থা পরিবর্তনে ব্যবস্থা

পরিবর্তন আর ব্যবস্থা পরিবর্তনে অবস্থা পরিবর্তন দ্বান্দ্বিক নিয়মে জরুরি। এই প্রতিনিধিসভা নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা মনে করি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, অনেকে আমাদের খোঁচা দেয়ার জন্য বলে বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ আছে কি? আমি তাদের

একটাই জবাব দেই, বামপন্থীদের ছাড়া বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আছে কি? স্বাধীনতার পর ৪৮ বছর দেশ ডান পন্থায় চলে ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে? শাসকশ্রেণির কাছে দেশটা এখন লুটের রাজ্য। তারা এখন এখানে টাকা রাখে না, নিয়ে যায় বাইরে। এখানকার পানি পান করে না, বিদেশি বোতলের পানি পান করে। শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের কোন দুশ্চিন্তা নাই, কারণ তাদের সন্তানদের এখন বিদেশে পড়ায়। একটা উদ্দেশ্য তাদের আছে সেটা হলো কীভাবে এখান থেকে রস সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ আখের গুছিয়ে নিতে পারে। এই পথেই যদি চলতে থাকে তাহলে দেশের কোন ভবিষ্যৎ নাই, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। সমাজ ধ্বংস হয়েছে, গণতন্ত্র তো ধ্বংস হয়েই গেছে। সরকার দাবি করে ফকিররাও এখন স্যান্ডেল পরে। আমি বলি আপনারা কিন্তু ফকিরের ফকিরত্ব ঘুচাতে পারেন নাই। স্যান্ডেল পরে তারা ভিক্ষাই করে। ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সরকারের কিন্তু দেশের ১৬ কোটি মানুষের জীবনের মান ৮ শতাংশ বাড়ে নাই কেন? বাকি টাকা কোথায়? আজ আপনাদের আলোচনায় অনেকখানি আত্মবিশ্বাস আমাদের দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে লুটপাটতন্ত্র, শোষণ-বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। এবারের বাজেট দেখেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক যারা শতকরা ৯৫% জন, তাদের কাছ থেকে পরোক্ষ করের নাম করে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ রাজস্ব কর আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের জন্য খরচ করা হচ্ছে একেবারে ছিটেফোঁটা। সব সুযোগ-সুবিধা ধনীদের জন্য। ঋণ নাও, খেলাপি হও। খেলাপি হলে কম সুদ দিতে হবে। তাহলে কোন আহাম্মক আছে যে ঠিকমতো ব্যাংকের ঋণ শোধ দেবে? বিদেশে টাকা পাচার হচ্ছে সেটার সাথে তারা যুক্ত। তাই পাচার ঠেকাতে কোন কার্যকর উদ্যোগ নাই। ধনী-গরিবের অর্থনৈতিক পার্থক্য বাড়ছে। এর পক্ষে তারা যুক্তি দেখায়, কিছু লোকের হাতে যদি সম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয়, তাহলে উন্নয়ন হবে কীভাবে, প্রবৃদ্ধি বাড়বে কীভাবে? কিছু সম্পদ চুয়ে পড়ে গরিবের কাছে যাবে। কিন্তু সম্পদ চুয়ে পড়ে গরিবের কাছে যায় না, যায় সুইজারল্যান্ডে, মালয়েশিয়ায়, কানাডায়। এই লুটেরাদের কাছে সম্পদ গেলে তা দেশের বাইরে চলে যায়। কিন্তু এই টাকা যদি গরিব মানুষের হাতে থাকে তাহলে সেই টাকা দেশেই থাকতো। গার্মেন্টস কর্মীসহ যারা কলেকারখানায় কাজ করে তাদের টাকা বিদেশ যায় না, যায় গ্রামে। গার্মেন্টস মালিকদের টাকা যায় বিদেশে। পাকিস্তান আমলেও সাম্প্রদায়িকতা এখনকার মতো ছিল না। জঙ্গিগোষ্ঠী বিপদজনক, কিন্তু তারা সংখ্যায় বেশি না। অভিযান চালিয়ে এদের পাকড়াও করে শেষ করা যায়। কিন্তু সমাজের মানসিকতার ভেতর যদি সাম্প্রদায়িকতা ঢুকিয়ে দেয়া হয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনাচরণে তাহলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেটা থাকে, তা দূর করা যাবে না। নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম অবস্থা। অপরাধ, নারীধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ বাড়ছে। ধর্ষণের পর হত্যা করা হচ্ছে। আগে লাশ দুই টুকরা করা হতো, এখন ১৪ টুকরা করা হচ্ছে–এটাই উন্নয়ন হচ্ছে। অপরাধের বর্বরতা বাড়ছে। আমাদের দেশ কতটুকু স্বাধীন? জোট নিরপেক্ষ নীতির জন্য পাকিস্তান আমল থেকে আমরা লড়াই করেছিলাম, শেখ হাসিনা সরকার আমাদের সৌদি আরবের সামরিক জোটে ঢুকাইছে।

কমরেড সেলিম বলেন, একটা ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার আমাদের উপর স্থায়ীভাবে চেপে বসেছে। আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি, তার উন্নতি হয়েছে এখন দিনের ভোট আগের রাতেই হয়ে যাচ্ছে। কৃষি বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও, ভোটাধিকার বাঁচাওয়ের সাথে যোগ করতে হবে রাজনীতি বাঁচাও। প্রত্যেক মানুষ তার উপলব্ধি থেকেই বুঝতে পারছে যে, বুর্জোয়া হালুয়া-রুটির রাজনীতি আজ শেষ। এখন আদর্শের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মানুষ বিশ্বাস করে যে, বামপন্থীরাই এখন আদর্শের ঝান্ডাকে সমুন্নত রেখেছে। আমদের সম্মানও করে সে কারণে। চারপাশে এত ইস্যু!! নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি আমরা। ইস্যুর মূল একটাই। সেটা হলো পুঁজিবাদী ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার।

অনেকে দূরের শত্রু দেখেন কাছের শত্রুকে দেখেন না। আমরা প্রেসক্লাবের সামনে সাম্রাজ্যবাদকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেই কিন্তু নিজের এলাকার ইউনিয়ন মেম্বার, চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যানদের চুরি দেখি না। কারণ, সেখানে লড়াই সরাসরি, নাকের কাছে। তখন আমার বুক কাঁপে। মানুষকে এসকল সমস্যা সম্পর্ক সচেতন করতে না পারলে সে মূল সমস্যা কখনও ধরতে পারবে না। এলাকার সমস্যা বাদ দিয়ে দেশের সমস্যা সমাধান করা যাবে না। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি করছে হাসিনা, খালেদা। এখান থেকে মুক্ত হতে হলে বামপন্থীদের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে। এই ব্যাপারে কোন পিছুটান রাখা যাবে না। কারণ আমরা এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। এরশাদ মারা গিয়েছে কিন্তু খালেদা-হাসিনারাই এরশাদের চিন্তাকে বহন করছে, বাস্তবায়ন করেছে।

কমরেডস, ভুল আমরা সবাই করি। সব দলই ছোটখাট ভুল করে। ভুল করাটা অন্যায় না, কিন্তু ভুল না শুধরানো আর ভুল থেকে শিক্ষা না নেয়াটাই অন্যায়। মন্দের ভালো তত্ত্ব আর চলবে না। আইএস এর জায়গায় যদি তালেবান আসে তা হলে মানুষ চিন্তা করবে আইএসের চাইতে তালেবান তো ভালো; তালেবানের জায়গায় জামাত আসলে মনে হবে মন্দের ভালোটা তো এসেছে। জামতের চেয়ে বিএনপি ভালো, বিএনপির চেয়ে আওয়ামীলীগ ভালো। বিচারের এই মানদণ্ডটাই বাদ দিতে হবে। না হলে ইতিহাসের চক্র আমাদের একই গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে দেবে। অন্যের জন্য

শতরঞ্চি বিছায়ে দিব আর তারা এসে বক্তৃতা করবে এই নীতি ভুলে যেতে হবে। রাষ্ট্র ক্ষমতাকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে আমাদের কার্য পরিচালনা করতে হবে। আপনাদের কথা শুনেই বলছি সেদিন বেশি দূরে না যেদিন বঙ্গভবনে লাল পতাকা উড়বে। তবে তার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে অব্যাহত লড়াই আমাদের করতে হবে। ইতিহাসে বারবার সুযোগ আসে না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি জামাত রাজনীতিকে এখন ব্যবসায় পরিণত করেছে। এর বিপরীতে আপনাকে বাস্তব শক্তি অর্জন করতে হবে। এখন রাজনৈতিক একটা শূন্যতা চলছে। এই শূন্যতা আমাদেরই পূরণ করতে হবে। শূন্যতা সবসময় থাকবে না। এটাই সময়। এর জন্য একটা জেনারেশনকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। জনভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। কর্মীদের আচরণ জনগণের মাঝে উদ্দীপনা তৈরি করতে পারে। আমাদের মধ্যবিত্ত কমরেডরা উত্তেজনামূলক কাজ করতে পছন্দ করেন। কিন্তু কষ্টকর কাজগুলো করতে চান না। কিন্তু এই কাজগুলোই সংগঠন গড়ে তোলার জন্য জরুরি। কৃষকরা এবার কি সংকটে পড়েছিল। আমরা যদি ২০০ ইউনিয়নেও যেতে পারতাম, কমরেডদের সেই উদ্যোগে পাঠানো গেল না। কমরেডরা সেটার গুরুত্ব বুঝল না, কারণ রোমাঞ্চকর কাজ না এটা। আসুন জোটকে এমনভাবে গড়ে তুলি যেন সেটা পার্টির চেয়ে কম হলেও যেন ফ্রন্টের চেয়ে বেশি হয়। কমরেডস, সামনে অনেক কাজ বাকি আছে। তার জন্য জোরদারভাবে তৈরি হোন।

কমরেড সাইফুল হক বলেন, ৩০ ডিসেম্বর '১৮ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রমাণ করেছে তাদের অধীনে আর কোন নির্বাচন সম্ভব নয়। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছে। বর্তমান সরকার জবরদস্তি করে ক্ষমতায় আছে। আমরা জনগণের ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভাতের অধিকার, কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করে জবরদস্তিরও জবাব দিব, গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি সংসদের যাওয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান সংসদ ও সরকারের নৈতিক বৈধতা তৈরি হবে না।

কমরেড মোশারফ হোসেন নান্নু বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক সভাপতির বক্তব্যে বলেন, বাম গণতান্ত্রিক জোট গত ১ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। জনগণের নানা সমস্যা-সংকট নিরসনের দাবিতে রাজপথে আপষহীনভাবে লড়াই করছে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৭ জুলাই দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়েছে। শমিকের মজুরি, কৃষকের ফসলের দামসহ প্রতিটি ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করেছে। তিনি ৩০ ডিসেম্বর ভোট ডাকাতির সংসদ ভেঙে দিয়ে দ্রুত নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান। তিনি আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন মোকাবেলায় জনগণের সংগ্রামী ঐক্য জোরদার করে বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।